ধর্ষণ : অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের পর্যালোচনা

ইরফানুর রহমান রাফিন

"Sexual objectification is the primary process of the subjection of women. It unites act with word, construction with expression, perception with enforcement, myth with reality. Man fucks woman; subject verb object."-Catharine Mackinnon

এই পহেলা বৈশাখে টিএসসি এলাকায় যে ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে গেল, সে প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে অদ্ভুত সব বক্তব্য হাজির করছেন কেউ কেউ। এসব বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে বক্তাদের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি, দিনের শেষে যা প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষেই যাবে। এ রকম একটি বক্তব্য হচ্ছে 'কাজটি করেছে বহিরাগতরা', যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনিয়ার দেবদূতরা পড়াশোনা করে, যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দিন কোনো ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট পুরুষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠেনি। আর বহিরাগতবিদ্বেষে প্রকাশ পায় ঔপনিবেশিক উচ্চম্মন্যতার বোধ, যেন বিশ্ববিদ্যালয় সাহেবি এলাকা আর বহিরাগতরা নেটিভ, এলাকাটি অপবিত্র হয়ে যাবে বহিরাগতরা প্রবেশ করলে। বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চায় বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কতটুকু? মৌলিক গবেষণা কী পরিমাণে হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে? অপ্রিয় সত্য কি এটাই নয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সবচেয়ে বড় উচ্চশিক্ষিত কেরানি তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে?

এমনই আরেকটি অদ্ভুত বক্তব্য 'নারীদের পোশাক দায়ী।' যে দেশে তিন বছরের কন্যাশিশুর ধর্ষিত হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা, সেখানে পোশাককে দায়ী করা প্রতিক্রিয়াশীলতাই নয় শুধু, রীতিমতো নির্বুদ্ধিতা। অনেকে সুযোগ পেয়ে বোরকার পক্ষে সাফাই গাইবেন, তাঁদের উদ্দেশে শুধু এটুকুই বলার আছে, বোরকা ব্যুৎপত্তিগতভাবে এলিটিজমের সাথে সম্পর্কিত একটি পোশাক। বোরকা কোথাও কাউকে ধর্ষণ থেকে বাঁচায়নি। আত্মরক্ষামূলক কারণে বোরকা পরিহিতারা সহমর্মিতা পেতে পারেন, কিন্তু যৌন নিপীড়কের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে আড়াল করাও 'এক ধরনের আত্মহত্যাই'। আশির দশকে মিসরে বোরকা পরিহিতা প্রাপ্তবয়স্কা নারীর অভাব না থাকলেও কিছু বিশেষ কারণে যৌন অবদমন ও পুরুষালি ক্ষমতা পৈশাচিকতার এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে অনেক কন্যাশিশু আপন বড় ভাইয়ের যৌন আগ্রাসনের শিকার হতো।[১]

বোরকা ব্যুৎপত্তিগতভাবে এলিটিজমের সাথে সম্পর্কিত একটি পোশাক। বোরকা কোথাও কাউকে ধর্ষণ থেকে বাঁচায়নি। আত্মরক্ষামূলক কারণে বোরকা পরিহিতারা সহমর্মিতা পেতে পারেন, কিন্তু যৌন নিপীড়কের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে আড়াল করাও 'এক ধরনের আত্মহত্যাই'।

'কতিপয় বখাটের' ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠা উচিত। সিএইচটিতে ধর্ষণের জন্যও কি 'কতিপয় বখাটে' দায়ী? প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় আসছে যে শত শত ধর্ষণের খবর, এবং আসছে না যে শত শত ধর্ষণের ঘটনা, সেসবের জন্যও কি 'কতিপয় বখাটে' দায়ী? বাংলাদেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় নারী শ্রমিকরা মাঝেমধ্যেই যেসব মালিক, ম্যানেজার, সুপারভাইজার কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, তারাও কি 'কতিপয় বখাটে?' সম্প্রতি এক গারো তরুণীকে চলন্ত মাইক্রোবাসে গণধর্ষণ করা হয়। ভিকটিম ভাটারা থানায় গিয়েছিলেন মামলা করতে, পরে বাংলা ট্রিবিউনের এক সাংবাদিক সেই থানায় গেলে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা হাসতে হাসতে তাঁকে বলেন, 'মালডার যা শরীল, পাঁচজনে মিলা মজা নিছে।' তো, 'মালের' নিরাপত্তায় নিয়োজিত 'জনগণের বন্ধু' এই ভুসিমাল, সেও কি তাহলে অই 'কতিপয় বখাটের' অন্তর্গত? দেখা যাচ্ছে, 'কতিপয় বখাটেরাই' এই দেশ চালাচ্ছে!

বাংলা নববর্ষে টিএসসিতে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেনি। তা-ই ঘটেছে, যা এই দেশে সারাক্ষণ ঘটছে। বাঙালি নারীর সাথে। আদিবাসী নারীর সাথে। কালো নারীর সাথে। ফর্সা নারীর সাথে। অধার্মিক নারীর সাথে। ধার্মিক নারীর সাথে। ভদ্রঘরের ওয়াইফের সাথে। অভদ্রঘরের হোরের সাথে। কেউ যদি নিজেকে নিরাপদ ভাবেন, তিনি আহাম্মক।

ধর্ষণের তাত্ত্বিক ভিত্তি

ক্ষমতা-সম্পর্ক জিনিসটা কী? দুজন ব্যক্তি, দুটি দল, দুটি গোষ্ঠী, দুটি শ্রেণি, দুটি বর্ণ, দুটি জাতি এবং দুটি লিঙ্গের মধ্যে একটি যখন অপরটির ওপর আধিপত্য করে; এবং যেই ব্যবস্থার মধ্যে তারা বাস করছে, সেই ব্যবস্থা যখন এই আধিপত্যকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে চিহ্নিত করে, তখন আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্ষমতা-সম্পর্ক বলতে পারি। এই ক্ষমতা-সম্পর্কে যে আধিপত্য করে, সে হচ্ছে 'নিজ', আর যে আধিপত্যের অধীনস্থ থাকে, সে হচ্ছে অপর। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ঐতিহাসিকভাবেই অপর। তাই পিতৃতান্ত্রিক ধর্মগুলো নারীকে অধীনস্থ করতে গিয়ে এই অধীনস্থতাকে লিপিবদ্ধ করেছে বিভিন্ন পুণ্যগ্রন্থে। ফলে হাভাহ জন্ম নিয়েছেন আদমের হাড় থেকে, দুর্গার শক্তি এসেছে পুরুষ দেবতাদের শক্তি থেকে, এবং নারীর নিয়তি হয়ে উঠেছে অধীনস্থ থাকা। পিতৃতন্ত্রের ঈশ্বর HE, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব নবী HE, এমনকি অ্যাঞ্জেলরাও HE। প্রাক-পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্র নারীকে দেখত পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে, পুঁজিবাদ নারীকে সম্পত্তি থেকে পণ্যে পরিণত করেছে, তাই পুঁজিবাদের পৃথিবীতে কারো মিষ্টি বউ হওয়ার চেয়ে যৌনাবেদনসম্পন্ন নায়িকা হওয়া অধিকতর আকর্ষণীয়। পুঁজিবাদ বেশ্যাবৃত্তির প্রথাগত আঞ্চলিক চরিত্রকেও বদলে দিয়েছে, বিশ্বজুড়ে তৈরি করেছে একটা সেক্স ইন্ডাস্ট্রি, এবং সেক্সুয়াল ট্রাফিকিংকে পরিণত করেছে বৈশ্বিক ব্যবসায়। শিলা জেফরি তাঁর 'The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade (2009)'-এ এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদের কালে এমনকি 'বিজ্ঞানীরাও' বিশ্বাস করেন পুরুষ-শ্রেষ্ঠতায়, যাঁরা 'বস্তুনিষ্ঠভাবে' যুক্তি দেন নারীর অধীনস্থতার

পক্ষে, ঈশ্বরের জায়গায় যাঁরা শুনতে পান 'প্রকৃতির' কণ্ঠস্বর।[২]

ফেমিনিজমের বিভিন্ন ধারা নারী-পুরুষের অসম ক্ষমতা-সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেও র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরাই প্রথম পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে চিহ্নিত করেন। কেইট মিলেট একে বলেন লৈঙ্গিক রাজনীতি, আর শুলামিথ ফায়ারস্টোন মার্ক্সবাদী পরিভাষা ব্যবহার করে এর নাম দেন লিঙ্গ দ্বান্দ্বিকতা। সুজ্যান ব্রাউনমিলার দেখিয়েছেন, ধর্ষণ এমন একটি কাজ, যার মাধ্যমে সব পুরুষ সব নারীকে একটি আতঙ্কের পরিস্থিতিতে রাখে। এই আতঙ্কে রাখার পেছনে একটা রাজনীতি আছে, এটাকে সেক্স-ক্লাস সিস্টেমের ডিসিপ্লিনারি মেকানিজম বলা যায়, যেখানে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে অন্য মেয়েদের মেসেজ দেওয়া হয়, পুরুষ-নিয়ন্ত্রণে না থাকতে চাওয়ার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। যুদ্ধকালীন ধর্ষণের পেছনে অবশ্য নারীর শরীরের শুদ্ধতাবিষয়ক পিতৃতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী কারণও কাজ করে, কারণ যুদ্ধের সকল পক্ষই প্রতিপক্ষের নারীকে প্রতিপক্ষের জমি ও জাতির ধারক হিসেবে দেখে, যদিও যুদ্ধে অকুপাইং ফোর্সের ব্যবস্থাগত গণধর্ষণের তুলনায় লিবারেটিং ফোর্সের প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে করা ব্যক্তিগত ধর্ষণের সংখ্যা বোধগম্য কারণেই অনেক কম হয়ে থাকে। যুদ্ধের সময় ধর্ষণ করে দুনিয়ার সকল সেনাবাহিনী। কেন? কারণ অস্ত্রের ওপর পুরুষের রয়েছে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। কারণ সেনাবাহিনী হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার রাষ্ট্রীয় প্রতীক। কারণ সেনাবাহিনীর জন্য ধর্ষণ একটা বীরত্বের ব্যাপার। সামরিক মনস্তত্ত্ব হেজিমনিকভাবে প্রভাবিত করে অসামরিক ধর্ষকদেরও, যাদের কাছে পেনিস হচ্ছে অনেকটা অস্ত্রের মতো, যা ব্যবহৃত হয় নারীকে রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত-পরাজিত করার কাজে।[৩] ধর্ষণ অনেক সময়ই রাজনৈতিক মতাদর্শের কাজে আসে, ধর্ষণের (ছদ্ম) বিরোধিতার আড়ালে সম্পন্ন হয় মতাদর্শিক প্রচারণা, যেমনটি দেখতে পাই যুদ্ধবিষয়ক 'সৃষ্টিশীল' কাজে। একটি ভালো উদাহরণ সাম্প্রতিক 'ওয়ার চাইল্ড' চলচ্চিত্রটি, যেখানে ধর্ষণের (ছদ্ম) বিরোধিতা সুনিপুণ দক্ষতায় ব্যবহার করা হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার জন্য, যেই চলচ্চিত্র থেকে ড. এম এ হাসানের গবেষণাগ্রন্থ 'যুদ্ধ ও নারী'তে লিপিবদ্ধ হওয়া যুদ্ধকালীন ধর্ষণের বাস্তবতা কয়েক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। ক্লজউইৎজ বলেছেন, যুদ্ধ কোনো অভিনব ঘটনা নয়, এটি রাজনীতির ধারাবাহিকতা, যুদ্ধকালীন ধর্ষণও তথাকথিত শান্তির সময়ে নারীর বিরুদ্ধে নিরন্তরভাবে চলতে থাকা ব্যক্তিগত ধর্ষণেরই ধারাবাহিকতা।

নারীর অধীনস্থতা থেকে যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া পর্যন্ত সবই অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের ব্যাপার। এটা কি খুব সহজেই বোঝা যায় না? কলোনিয়ালিজমের কালে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা দৈনন্দিন ভিত্তিতে শুয়েছে তাদের কৃষ্ণাঙ্গ দাসীদের সাথে, ধর্ষণ করেছে; এবং এজন্য তাদের কোনো বিচার হয়নি। কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গ নারী প্রভু শ্রেণির হলেও যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সম্পত্তি—ভালোবেসে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সাথে শুলে দুজনকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। টারজান কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষকে 'ধর্ষক/পশু' আর শ্বেতাঙ্গ নারীকে কল্পিত ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করা শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে 'দেবতা/ত্রাণকর্তা' বানিয়েছে, শিশুদের রক্তের ভেতরে গেঁথে দিয়েছে বর্ণবাদী ঘেন্না, এবং ধর্ষণকে ব্যবহার করেছে বর্ণবাদী ক্ষমতার রাজনীতিতে।[৪] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে যেসব পুরুষ কর্মী ছিলেন, ধর্ষক ও তাদের শুভানুধ্যায়ীরা সেসব পুরুষের বিরুদ্ধে 'চৌদ্দ মেয়ের সাথে শোয়া' বা 'যাকে-তাকে গর্ভবতী বানানোর' কষ্টকল্পিত কুৎসা রটিয়েছে, যেহেতু এসবে বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই। 'শ্লীলতাহানি', 'সম্ভ্রমহানি', 'ইভ টিজিং'—এইসব জোলো শব্দ ব্যবহার করে ধর্ষণ বা অন্যান্য নিপীড়নকে হালকা করে দেখাও ক্ষমতা-সম্পর্কের অসমতার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।[৫]

এ কারণেই টিএসসি এলাকায় অভিজিৎ রায়কে মৌলবাদীরা কুপিয়ে মেরে ফেললে হাতের নাগালে থাকা পুলিশ নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে থাকে, এবং এই একই কারণে পহেলা বৈশাখে প্রকাশ্যে নারীদের বস্ত্রহরণ করা ইতর পুরুষদের আইনশৃঙ্খলারক্ষী বাহিনী দেখতে পায় না

নিওলিবারালিজম ও ধর্ষণ

ঐতিহাসিকভাবে কলোনাইজড হওয়ায় পুঁজিবাদের উৎপাদনশীল খাতগুলোর বিকাশ বাংলাদেশে প্রায় ঘটেনি বললেই চলে, তাই এখানকার (লুম্পেন) বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদ বলতে লুটতরাজ বোঝে, বালু ফেলে নদী ভরাট করে বিপণিবিতান বানানো বা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া তাদের বৈশিষ্ট্য। আশির দশকে নিওলিবারালাইজেশনের কারণে গার্মেন্টসের মতো শ্রমঘন শিল্প ডাম্প করা হয়েছে বাংলাদেশে, এর পাশাপাশি চলছে ক্ষুদ্রঋণ আর এনজিওর মাধ্যমে প্রাক-পুঁজিবাদী কুটির শিল্প টিকিয়ে রাখা, 'কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর ঝোলাগুড়!'[৬] নিওলিবারাল রাষ্ট্রের চোখে প্রতিটি নাগরিকই সম্ভাব্য সন্ত্রাসী। তাই দাগি আসামিদের চিহ্নিত করার জন্য উদ্ভাবিত বায়োমেট্রিক্যাল টেকনোলজি আজকে এসে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করার মাধ্যমে নাগরিকদের নজরদারিতে রাখার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৭] এ কারণেই সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেডরুমে নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের কাজ নয়। এ কারণেই টিএসসি এলাকায় অভিজিৎ রায়কে মৌলবাদীরা কুপিয়ে মেরে ফেললে হাতের নাগালে থাকা পুলিশ নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে থাকে, এবং এই একই কারণে পহেলা বৈশাখে প্রকাশ্যে নারীদের বস্ত্রহরণ করা ইতর পুরুষদের আইনশৃঙ্খলারক্ষী বাহিনী দেখতে পায় না। নিওলিবারাল রাষ্ট্র শুধু শাসকদের নিরাপদে রাখে, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ নাগরিকরা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর মাত্র। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্কের এই অসমতা পুরুষ ও নারীর মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্কের অসমতার রাজনৈতিক রূপ, রাষ্ট্রীয় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সাথে মিল আছে পুরুষালি ধর্ষণ, উভয় ক্ষেত্রেই 'সীমার বাইরে' বল প্রয়োগ করা হয়। বলা দরকার, অই সীমাটাও রাষ্ট্র/পুরুষের স্বার্থেই নির্মিত। কিন্তু নিওলিবারাল রাষ্ট্রে নাগরিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও না থাকায় সেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। একইভাবে পুরুষালি সমাজেও ধর্ষণ এক ধরনের 'সীমা লঙ্ঘন', যা নারীর ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়। মিল রয়েছে দুটিতে। নিওলিবারাল রাষ্ট্রের চোখে যেমন নাগরিক মাত্রই সম্ভাব্য সন্ত্রাসী, পুরুষালি সমাজের চোখেও নারীমাত্রই সম্ভাব্য ধর্ষিতা। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বা পুরুষকে মহিমান্বিত করার জন্য নাগরিক বা নারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় করা হয়, যেন নাগরিকরা রাষ্ট্রের এবং নারীরা পুরুষের 'পবিত্র ভাবমূর্তি' ক্ষুণ্ন করার জন্যই বেঁচে আছে, যেন সন্ত্রাস বা ধর্ষণের সাথে রাষ্ট্র বা পুরুষের কোনো সম্পর্কই নেই!

সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা: ঔপনিবেশিক ধর্ষণ আইনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মতো 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' রাষ্ট্রগুলোর ধর্ষণ আইন যে কী পরিমাণ ঔপনিবেশিক (বলা বাহুল্য নয়,

উপমহাদেশের অধিকাংশ আইনই ঔপনিবেশিক, সাদা সায়েবরা চলে গেলেও যেসব আইন রেখে গেছে 'কালো চামড়া সাদা মুখোশরা', সেগুলো এখন এসব রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী 'স্বাধীনভাবে' ব্যবহার করছে জনগণের বিরুদ্ধে) নারীবিদ্বেষী, সেটা আজিজা আহমেদ দেখিয়েছেন ডয়েশে ভেলে ব্লগে তাঁর একটি লেখায়। সেখানে তিনি জানাচ্ছেন:

"... ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলো ১৮৬০ সালের পেনাল কোড অনুসরণ করে, যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় কার্যকর হয়েছে। পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সরকারের সময় পেনাল কোডে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছিল, কিন্তু তা আরো খারাপ বলে প্রতীয়মান হলো যেহেতু শরিয়া আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শরিয়া আইন অনুসারে, ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে, এটা প্রমাণ করার জন্য চারজন (পুরুষ) সাক্ষী লাগে। নইলে ভিকটিমকে সেই লোকের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে যে প্রকৃতপক্ষে তার ধর্ষক ছিল। নয়াদিল্লিতে গত ডিসেম্বরে একজন তরুণী ধর্ষিত হওয়ার পর ভারতের ধর্ষণ আইনসমূহ কিছু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে। নারী অধিকার লবিস্টরা ধর্ষণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে (জোরপূর্বক) পেনিট্রেশন ছাড়াও অন্যান্য যৌন আক্রমণকে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করেছেন। যাই হোক, বাংলাদেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা এখনো ১৫০ বছর পুরনো এবং এটা যেসব নারী এমন ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁদেরকে যথাযথ আইনি সহযোগিতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।" (তর্জমা ও ইটালিক আমার)[৮]

আজিজা আরো দেখাচ্ছেন, ধর্ষণের এই বৈষম্যমূলক আইনকে সহায়তা করে সমাজের মনোভাব, যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে একজন বিজ্ঞানীর গবেষণায়:

"ভিকটিমের ওপর সামাজিক চাপ এত প্রবল ও সিরিয়াস যে সম্প্রতি বাংলাদেশের গবেষণা সংস্থা আইসিডিডিআরে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করা রুচিরা তাবাসসুম নাভিদ জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে ধর্ষণ বা অন্য ধরনের যৌন আক্রমণের রিপোর্ট করা নারীদের সংখ্যা ভিকটিমদের মোট সংখ্যার ২ শতাংশেরও কম। আপাত দৃষ্টিতে, ভিকটিমরা চুপ থাকতে এবং একটা খুবই লো প্রোফাইল বজায় রেখে জীবন চালিয়ে নিতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এর মূল কারণ হচ্ছে, এ রকম ভিকটিমদের জন্য কোনো যথাযথ আশ্রয়গৃহ বা পুনর্বাসন পরিকল্পনা নেই। আদালতে ধর্ষণ প্রমাণ করা কঠিন। ভিকটিমরা জানেন যে তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ন্যায়বিচার তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবে। বহু নারী অধিকার কর্মী বলেন, নারীরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন এবং এর ফলে তাঁরা ভিকটিমাইজড হন। যাই হোক, এটা বোঝা দরকার যে সব সময় যে জ্ঞানের অভাব তাঁদেরকে আইনি সহায়তা চাওয়া থেকে দূরে রাখে তা নয়, বরং প্রতিকারের অভাবই তাঁদের পেছনে টেনে রাখে।" (তর্জমা ও ইটালিক আমার)[৯]

আইন প্রয়োগকারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আজিজা:

"বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারীরা তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় এবং সমন্বয়ের অভাব ভিকটিমের জন্য অধিকতর সমস্যা তৈরি করে। ধর্ষণের সংজ্ঞার সাথে সাথে আইনি কাঠামোর প্রক্রিয়াতেও পরিমার্জনা প্রয়োজন। (গত শতাব্দীর) নব্বইয়ের দশকে পুলিশের হেফাজতে ধর্ষণের একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছিল। ইয়াসমিন, রংপুরের এক তরুণী, একজন পুলিশ অফিসার কর্তৃক ধর্ষিত হয়। এই কেস অনুসারে, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন বলে, অভিযুক্তের দায়িত্ব নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করা। আদালতের সামনে প্রমাণ উৎপাদনের দায়িত্ব ভিকটিমের না।" (তর্জমা ও ইটালিক আমার)[১০]

পতিতাকৃত নারীরা, যাদেরকে নিওলিবারাল ব্যবসায়িক পরিভাষায় 'যৌনকর্মী' বলে আখ্যায়িত করা হয়, এই আইন তাঁদের জন্যও কী পরিমাণ সমস্যাজনক তাও তিনি দেখিয়েছেন:

"দুর্ভাগ্যবশত যৌনকর্মীরা ধর্ষণের রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ঝামেলা পোহান। এমনকি বর্তমান ধর্ষণ আইনও বলে যে নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে দৈহিক সম্পর্ক তৈরিই ধর্ষণ। যাই হোক, বাংলাদেশে একজন যৌনকর্মীর জন্য ধর্ষণের অভিযোগ দাখিল করা প্রায় অসম্ভব। পুলিশ এবং সমাজ, কেউই তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না।" (তর্জমা ও ইটালিক আমার)[১১]

সব শেষে, ধর্ষণের ভিকটিমের জন্য সবচেয়ে সমস্যা তৈরি করে যে খোদ সাক্ষ্য আইনটির ১৫৫(৪) নং ধারাটিই, আজিজার ভাষায় যা নিম্নরূপ:

"১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ নং ধারা বলছে, ধর্ষণের ক্ষেত্রে ভিকটিমকে তার চরিত্র ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে ইন্টারোগেট করা যাবে। ফলত, যখন একটা পুরুষকে ধর্ষণের বা আক্রমণের অভিযোগের জন্য প্রসিকিউট করা হয়, সে চেষ্টা করতে ও প্রমাণ করতে পারে ভিকটিম 'দুশ্চরিত্রা' ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি মেয়ে অন্য কোনো পুরুষের সাথে ফ্লার্ট করা বা অন্য ধরনের কোনো সম্পর্কে জড়িত থাকে, আদালত চাইলে তার অভিযোগ খারিজ করে দিতে পারে, যেহেতু অন্য কোনো পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়িত থাকার সামর্থ্য তার আছে।" [...] (তর্জমা ও ইটালিক আমার)[১২]

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) নং ধারার কথা এসেছে আজিজার লেখায়, কিন্তু তার ভয়াবহতার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায় ফাতেমা সুলতানা শুভ্রার একটি লেখা থেকে।[১৩]

এই আইনের ১৫৫ নং ধারার ৪ উপধারা বলছে, "কোন ব্যক্তি যখন বলাৎকার অথবা শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে ফৌজদারিতে সোপর্দ হন, তখন দেখানো যাইতে পারে, অভিযোগকারিণী সাধারণভাবে দুশ্চরিত্রা।" এই আইনের ফলাফল সম্পর্কে শুভ্রা ধারণা দিচ্ছেন এভাবে:

"[...] পুরুষালি মতাদর্শের সমাজে নারী 'ভোগের বস্তু' আর এই ধারণা নারীর ওপর পরতের পর পরতের নিপীড়ন চালায় (শুভ্রা, ২০০৮)। 'ভিকটিম' থেকে 'সার্ভাইভারে' পৌঁছানোর মাঝে নারী নানা নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং বিবিধ কাঠামোগত নিপীড়নের শিকার হন। এই বাস্তবতায় দেখা যায়, বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ ধর্ষণ মামলায় ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ এর ৪ উপধারার ভিত্তিতে অভিযুক্তদের কোনো শাস্তি হয় না। ২০১৩ সালের অপর একটি পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে শতকরা ৯৫ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮৮ ভাগ পুরুষ তথ্য দেন যে তাঁরা নারী বা কন্যাশিশুকে ধর্ষণ করলে কোনো রকম আইনি প্রক্রিয়া বা বিচারের সম্মুখীন হননি।"[১৪]

সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, শুভ্রার ভাষায়, নিম্নরূপ:

"মনে রাখা জরুরি যে, বাংলাদেশের পুরুষালি মতাদর্শের সমাজে নারী শরীরকে পুরুষালি ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি জায়গা হিসেবে দেখা হয়। মানে ধরেন, রাজনৈতিক কারণে যদি কোনো পুরুষকে হেনস্তা করতে হয়, তবে তাকে ধরে প্রহার করা হবে, কিন্তু একজন নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হবে কিংবা নারীটির ওড়না ধরে টান দেওয়া হবে (শুভ্রা, ২০০৮)। অর্থাৎ সহিংসতার একটি লিঙ্গীয় বিন্যাস রয়েছে (কান্নাবিরান, ১৯৯৬)। কেবল নারী পরিচয়ের জন্যই কিছু কিছু সহিংসতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করে চলে, বলবৎ রাখে। এই অবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এই ভাবনাও পুরুষালি এজেন্টের মধ্যে

তৈরি করে যে কেবল 'পুরুষ' হিসেবেই তার নারীর সম্মতি-অসম্মতির ঊর্ধ্বে 'যৌনক্রিয়ার' অধিকার রয়েছে (রেডফোর্ড ও কেলি, ১৯৯৬)। এই পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাসের জোরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮২ ভাগ পুরুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং শহুরে শতকরা ৭৯ ভাগ পুরুষ মনে করেন, এই যৌন সক্ষমতার জোরেই কমবেশি ধর্ষণকে সম্ভবপর করে তোলে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি এবং ধর্ষণের বিষয়টি আদতে পুরুষালি সংস্কৃতি, পুরুষালি আচরণ, পুরুষালি কাঠামো, এমনকি পুরুষালি জ্ঞান-আইন-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রমাগত অনুকূল পরিস্থিতি পেতে থাকে। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের বিরাজমান অসমতার সাথে নারীর প্রতি সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। [...]"[১৫]

'দুশ্চরিত্রা' প্রত্যয়টি আইনিভাবে ব্যবহৃত হলেও এটি সুসংজ্ঞায়িত নয়। না হওয়ার কারণ হচ্ছে চরিত্রসংক্রান্ত সামাজিক ধারণা। শুভ্রার তীক্ষ্ণ বর্ণনায় :

"আইনি ভাষায় 'দুশ্চরিত্রা' যে প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়, তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন খোদ আইনেই নেই। বলা নেই যে একজন নারী বা মানুষ কী কী করলে তাকে আইন 'দুশ্চরিত্রা' বলবে। তাহলে এই দুশ্চরিত্রা প্রত্যয়টি বিচারালয়ে কিভাবে সবাই বুঝতে পারে? সকলে এই 'দুশ্চরিত্রা' প্রত্যয়টিকে আইনের বাইরে থাকা নারীর যৌনতার ও শরীরকেন্দ্রিক 'ভালো-মন্দের' যে সামাজিক ধারণা রয়েছে, তার ভিত্তিতেই বুঝতে শেখে। সামাজিক সেই ধারণায় মনে করা হয়, রাতের অন্ধকারে, অচেনা মানুষ, অস্ত্রের মুখে, অপহরণ করে তুলে নিয়ে গেলে সম্ভবত ধর্ষণ হতে পারে। নারী হিসেবে আপনি যদি ধর্ষণের পর মরে যেতে পারেন, নিদেনপক্ষে আত্মহত্যা করে ফেলেন, তবেই হয়তো সমাজের মনে হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যে আপনি আদতে 'চরিত্রবান' ছিলেন, এবং চরিত্র একটা কচুপাতার পানির মতো ঝরে পড়ার সাথে সাথেই আপনি মরেও গেলেন এবং মরে গিয়ে প্রমাণ করলেন আদতে আপনি 'সতী'। সতীত্ব শেষ হওয়াতে আপনার জীবনেরও সমাপ্তি ঘটল এবং কেবল আপনারই তাই ধর্ষণ হতে পারে।"[১৬]

'দুশ্চরিত্রা' প্রত্যয়টির যৌনবাদী ব্যবহারের বর্ণনাও পাচ্ছি এভাবে :

"অযাচিতভাবে এবং অন্যায়ভাবে অধিকাংশ ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমের বিগত যৌন আচরণ ও চরিত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, অপরাপর আর কোনো মামলার ধরনের সাক্ষ্য এত জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে না, যতটা একজন সাক্ষী সাক্ষ্য আইনের মারফত ধর্ষণের মামলার ভিকটিমের চরিত্রসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারে। ভিকটিমের বিগত যৌন ইতিহাস নিয়ে কথোপকথন ও জিজ্ঞাসাবাদের সংস্কৃতি চালু থাকার দরুন অনেক নারী ও মেয়েশিশু ধর্ষণ মামলায় অভিযোগ আনতে ভয় পায়, কেউ কেউ মামলা মাঝপথে বন্ধ করে দেন অথবা কখনো কখনো প্রতিপক্ষ বা আসামিপক্ষের উকিলের জেরায় ভিকটিম নারী মানসিক-সামাজিক ও শারীরিকভাবে ট্রমাটাইজড হয়ে পড়েন; এমনকি আত্মহননের পথ বেছে নেন। মোট ফলাফলে ধর্ষণের অভিযোগ বিচারের বাইরে রয়ে যায়। ধামাচাপা পড়ে যায়। ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমের সম্মতি বিষয় যেখানে প্রাসঙ্গিক, সেখানে 'চরিত্র'সংক্রান্ত আলোচনা আদতে কোনো অর্থ বহন করে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, চরিত্রসংক্রান্ত আলোচনা মামলার ট্রায়ালে, এমনকি অভিযোগ প্রমাণিত হলেও সাজাকে লঘু করে দিতে ক্রিয়াশীল থাকে।"[১৭]

শুভ্রার লেখা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনও পুরুষালি ক্ষমতা-কাঠামো কর্তৃকই নির্মিত ও ধারণকৃত। তাই বাংলাদেশের মতো দেশে আইনি সংস্কারের লিবারাল ফেমিনিস্ট দাবি প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে, কিন্তু এর যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণ, তা স্রেফ আইনি সংস্কার করে বদলানো যাবে না।

বিবাহ, পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফি

নারীর শরীরের ওপর তাঁর সার্বভৌম অধিকার রয়েছে, প্রত্যক্ষ সম্মতি ছাড়া যাতে কারো প্রবেশাধিকার নেই–এই চিন্তার সর্বজনীনীকরণ ছাড়া ধর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। বৈবাহিক ধর্ষণ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই ফোর্সড সেক্স বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কখনো কখনো যেটা গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর/শ্বশুরবাড়ির আগ্রহের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। নারীর রিপ্রোডাকটিভ অর্গানের ওপর তাঁর সার্বভৌম অধিকার সর্বজনীনভাবে স্বীকার করে না নিলে ধর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। পর্নোগ্রাফি নারীকে যেভাবে কামসামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করে, এবং কখনো কখনো যেভাবে যৌন সহিংসতাকে স্বাভাবিকীকৃত করে উপস্থাপন করে, তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিরাজমান ধর্ষণ বাস্তবতা কর্তৃক প্রভাবিত হয় এবং দ্বান্দ্বিক নিয়মেই এই বাস্তবতার পুনরুৎপাদনে ভূমিকা রাখে। র্যা

পর্নোগ্রাফি নারীকে যেভাবে কামসামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করে, এবং কখনো কখনো যেভাবে যৌন সহিংসতাকে স্বাভাবিকীকৃত করে উপস্থাপন করে, তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিরাজমান ধর্ষণ বাস্তবতা কর্তৃক প্রভাবিত হয় এবং দ্বান্দ্বিক নিয়মেই এই বাস্তবতার পুনরুৎপাদনে ভূমিকা রাখে

ডিকাল ফেমিনিস্ট আন্দ্রিয়া ডোরকিন ও জন স্টল্টেনবার্গ তাঁদের লেখায় দেখিয়েছেন, ধর্ষণ, পর্নোগ্রাফি, প্রস্টিটিউশন–সবই পুরুষালি ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, পর্নোগ্রাফিতে যুক্ত থাকা ও পর্নোগ্রাফির বাইরে থাকা উভয় প্রকারের নারীদেরকেই তাঁদের পিম্প বা হাজব্যান্ড/বয়ফ্রেন্ড কর্তৃক অ্যানাল/স্যাডো-ম্যাসোকিস্ট/গ্রুপ সেক্স ফোর্স করার যে পৈশাচিক বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন, পাঠকদের স্নায়ু ফালি ফালি করে কাটতে না চাওয়ার কারণে তা বিবৃত করা থেকে বিরত থাকছি, ষাটের দশকে ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অ্যান্টি-ওয়ার ডেমনস্ট্রেশনে এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সিভিল রাইটস মুভমেন্টে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা র্যা ডিকাল ফেমিনিস্টদের নেতৃত্বে সত্তরের দশকে ঝইঁভভ-এর মতো অকল্পনীয় পরিমাণ সহিংস পর্নোগ্রাফির প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে ডেমনস্ট্রেট করার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্নোগ্রাফিবিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটে, মূলত ক্যাথারিন ম্যাককিনন আর আন্দ্রিয়া ডোরকিনের আপোসহীন সংগ্রামের ফলে আশির শুরুতে মিনিয়াপোলিস ও ইন্ডিয়ানাপোলিস নামে দুটি স্টেটে পর্নোগ্রাফিবিরোধী আইনও পাস হয়, যা 'সিভিল রাইটস অ্যান্টি-পর্নোগ্রাফি অর্ডিন্যান্স' নামে খ্যাত। কিন্তু ১৯৮৬-র ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের 'ফ্রিডম অফ স্পিচের' সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বাতিল করে দেয় অর্ডিন্যান্সটি, যেন পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহৃত বাস্তব নারীর ওপর এবং পর্নোগ্রাফির কারণে এর বাইরে থাকা বাস্তব নারীর ওপর করা পৈশাচিকতার পর্যায়ে পড়া নৃশংসতম নির্যাতনগুলো 'স্পিচ', এই রায়ে সিভিল রাইটস লইয়ার ম্যাককিনন হতাশ হয়ে বলেছিলেন, "নারী অধিকার একটা রসিকতা।"[১৮] পুরুষালি ক্ষমতা ও পুঁজিবাদী

মুনাফার স্বার্থে নারীকে বলি দেওয়ার বিরুদ্ধে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর ব্যাপারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া সুস্থ সমাজের পর্নোগ্রাফির প্রয়োজন হবে না, যেই সমাজ অসুস্থ সেটা নিজেই একটা পর্নোগ্রাফিক সোসাইটিতে পরিণত হয়, পর্নোগ্রাফি থাকলে ধর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। প্রস্টিটিউশন হচ্ছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম নিপীড়নমূলক ব্যবসা, একটি মেয়েকে পতিতায় পরিণত করার জন্য অনেক সময়ই ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়, প্রস্টিটিউশন থাকলে ধর্ষণ বন্ধ করা যাবে না।

শেষ কথা

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, ধর্ষণ 'লালসা' নয়, এটি নারী-পুরুষের অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের নিকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ। যে কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রেই শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু যে অন্যায় শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত, শুধুই শাস্তি প্রদান সেই অন্যায় দূর করবে না। তাই শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি নারী-পুরুষের অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের বিরাজমান বাস্তবতা কিভাবে পাল্টানো যায়, কিভাবে পুরুষত্বের সামাজিক নির্মাণকে মানবিকীকৃত করা যায়, এসব নিয়ে জ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতারও প্রয়োজন রয়েছে। মানব সভ্যতার বিকাশে পুরুষের পেনিস-টেস্টিকলস ও নারীর ভ্যাজাইনা-ক্লাইটোরিসের চেয়ে তাদের অভিন্ন মগজের জ্ঞান ও হৃদয়ের প্রেম যে অনেক বেশি মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে, এই বোধটা যদি সর্বজনীন করা না যায়, ধর্ষণ অব্যাহত থাকবে। আর সেটা হবে সভ্যতার ইতিহাসের শোচনীয়তম পরাজয়। ইতিহাস তো মানুষেরই সামষ্টিক সৃষ্টিশীলতার নির্জন স্বাক্ষর, সেই ইতিহাস বর্বরতার কাছে পরাজিত হবে না, আমরা সেটা কখনো হতে দিতে পারি না। আমাদেরকে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, শ্বাশ্বত শান্তির ব্লু হেলমেট পরা যাবে না, কেননা জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, "যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই: কোথাও আঘাত ছাড়া–তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই..."

ইরফানুর রহমান রাফিন: লেখক, রাজনৈতিক কর্মী
ইমেইল: *erfanrafen@gmail.com*

তথ্যসূত্র:

১. দেখুন, ফাতিমা মেরনিসি, বোরকা ও পুরুষ এলিটঃ ইসলামে নারী অধিকারের নারীবাদী ব্যাখ্যা, নিউ ইয়র্কঃ বেসিক, ১৯৯১। আরো দেখুন, আনু মুহাম্মদ, 'বোরখার নারী, নারীর বোরখা', নারী, পুরুষ ও সমাজ, ঢাকাঃ সংহতি, ২০১২ (১৯৯৬), পৃষ্ঠা ১৯৫-২০৪। আরো দেখুন, নাওয়াল এল সাদাওয়ি, 'কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে যৌন আগ্রাসন', হাওয়ার লুকিয়ে রাখা মুখঃ আরব বিশ্বে নারী, লণ্ডনঃজেড, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১২-১৬।

২. যেমনটা বলে থাকেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 'রিয়ালিস্ট' তাত্ত্বিকরা, যাদের ধর্মীয় ঈশ্বরের 'বৈজ্ঞানিক' নাম 'প্রকৃতি'।

৩. দেখুন, সুজ্যান ব্রাউনমিলার, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেঃ পুরুষ, নারী ও ধর্ষণ, নিউ ইয়র্ক, টরন্টো, লন্ডন, সিডনি, অকল্যাণ্ডঃ ব্যান্টাম বুকস, ১৯৭৫।

৪. দেখুন, ফ্রানজ ফানোঁ, কালো চামড়া শাদা মুখোশ, নিউ ইয়র্কঃ গ্রোভ, ১৯৬৭। আরো দেখুন, কালামু ইয়া সালাম, 'ধর্ষণঃ আফ্রিকান আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি র্যাডিকাল বিশ্লেষণ', আমাদের নারীরা আমাদের আকাশকে অধঃপতন থেকে বাঁচায়, নিউ অরলিয়েন্সঃ কমবো, ১৯৮০। ধর্ষণের রাজনৈতিক অপব্যবহার বর্ণবাদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, ভারতের বর্ণপ্রথার ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল আছে, দলিত নারীদের ধর্ষণ দলিতদের প্রতি ঘৃণার অংশ।

৫. জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই আন্দোলনে ধর্ষণ শব্দটির ব্যবহারে কিছু 'বুদ্ধিজীবী' এতো কষ্ট পেয়েছিলেন, যে তারা বলেছিলেন, শব্দটি দেখলে নাকি কষ্টে তাদের অজু ভেঙে যায়! একজন একটিভিস্টদেরকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেনো ধর্ষণকে ধর্ষণ না বলে অভিহিত না করে। প্রতিক্রিয়ায় শুনতে পেয়েছিলেন, "ধর্ষণকে ধর্ষণ বলবো না তো কি বলবো স্যার, গোলাপফুল বলবো?"

৬. দেখুন, আনু মুহাম্মদ, বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, ঢাকাঃসংহতি প্রকাশন, ২০০৮ (১৯৮৩)।

৭. দেখুন, জর্জিয়ো আগামবেন, "নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্র থেকে বঞ্চিতদের ক্ষমতার প্রাক্সি" (নিকোস পৌলানজাস ইন্সটিটিউট ও সিরজিয়া ইয়থ কর্তৃক আয়োজিত গণ বক্তৃতা), ক্রনোসম্যাগ, এথেন্স, নভেম্বর ১৬, ২০১৩ http://www.chronosmag.eu/index.php/g-agamben-for-a-theory-of-destituent-power.html একসেসড হয়েছে জুলাই ১৭, ২০১৫তে।

৮. দেখুন, আজিজা আহমেদ, "বাংলাদেশের ধর্ষণ আইনের লিগাল কাঠামো", ডয়েশে ভিলে, ডিসেম্বর ০৪, ২০১৩, http://blogs.dw.de/womentalkonline/2013/12/04/the-legal-framework-of-bangladeshs-rape-law/ একসেসড হয়েছে মার্চ ১৫, ২০১৫তে।

৯. পূর্বোক্ত

১০. পূর্বোক্ত

১১. পূর্বোক্ত

১২. পূর্বোক্ত

১৩. দেখুন, ফাতেমা সুলতান শুভ্রা, "ধর্ষণ, 'দুশ্চরিত্রা' নারী ও বাংলাদেশের আইনঃ সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা", সর্বজনকথা, ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, মে ২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৩-৭২।

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. দেখুন, আন্দ্রিয়া ডোরকিন, 'নারীবাদ-বিরোধিতা', ডানপন্থী নারী, নিউ ইয়র্কঃ পেরিজি, ১৯৮৩ (১৯৭৯), পৃষ্ঠা ১৯৫-২৩৭। আরো দেখুন, জন স্টল্টেনবার্গ, 'পর্নোগ্রাফি ও পুরুষ শ্রেষ্ঠতাবাদ (সেক্সে নিষিদ্ধ ভাষা, পর্নোগ্রাফি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ইস্যু হিসেবে পর্নোগ্রাফিকে মোকাবেলা করা)', পুরুষ হওয়ার আহবান প্রত্যাখ্যান করাঃ সেক্স ও ন্যায্যতা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী, লন্ডনঃইউসিএল, ২০০০ (১৯৮৯), পৃষ্ঠা ১০২-৫৫। পর্নোগ্রাফিবিরোধী আন্দোলন/অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আরো দেখুন, আন্দ্রিয়া ডোরকিন ও ক্যাথারিন ম্যাককিনন, পর্নোগ্রাফি ও নাগরিক অধিকারঃ নারীর সমঅধিকারের জন্য এক নতুন দিন, মিনেসোটাঃ অর্গানাইজিং এগেইন্সট পর্নোগ্রাফি, ১৯৮৮।